লোকদেবতা দক্ষিণ রায় : আলাপচারিতা

প্রণব সরকার

সুন্দরবনের লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত ও বিবর্তিত লৌকিক দেবতার নাম দক্ষিণ রায়। কোনও কোনও পুঁথিতে আবার 'দক্ষিণা রায়' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার মানুষের কাছে তিনি 'দক্ষিণ রায়' দক্ষিণ দর, 'দক্ষিণ দ্বার' এবং দক্ষিণেশ্বর' নামে পরিচিত। ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তী, সন্দেশখালির মানুষের কাছে একটাই ব্যক্তির পরিচয় তিনি দক্ষিণেশ্বর। কোথাও কোথাও তাকে 'বারাঠাকুর' বলে থাকেন ভক্তরা।

এই দক্ষিণ রায়কে বিভিন্ন গবেষক নিজের মতো করে পরিচয় দান করার চেষ্টা করেছেন। তথ প্রমাণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন অন্যের যুক্তি ও দাবি সঙ্গত নয়। ফলে, দক্ষিণ রায়কে নিয়ে এত বেশি পণ্ডিত ও সুধীজন এত গবেষণা নিবন্ধ লিখেছেন, এত ভিন্ন প্রকার মতামত দিয়েছেন যে, সুন্দরবনের আর কোনও লৌকিক দেবতার ভাগ্যে তো জোটেনি। আর গোলমাল হয়েছে সেখানেই পরবর্তী কোনও গবেষক এ নিয়ে গবেষণা করতে এলে অসংখ্য পারস্পরিক সিদ্ধান্ত বিচার করে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা আদৌ সম্ভব হচ্ছে না।

এর অন্যতম কারণ হচ্ছে দক্ষিণ রায় যুগে যুগে বিবর্তিত হয়েছেন লোক সংস্কৃতির গতিশীল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে। ফলে বিভিন্ন সময়ের অর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির ও জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজন এই দেবতাকে নিজের মতো গড়ে তুলেছেন, প্রচার করেছেন। ফলে কালে কালে তাঁর রূপান্তর অর্থাৎ সংযোজন-বিয়োজনের ফলে আদিম পরিচয় আজ কুয়াশাচ্ছন্ন ও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। ফলে তাঁর সর্বজনীন রূপকে ধরে নিয়েই আলোচনার মাধ্যমে লোকহিতকর অসাম্প্রদায়িক পরিচায় দানের চেষ্টা করাই শ্রেয়। খণ্ড দৃষ্টিতে দেখলে এই লোকদেবতার পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য দর্শন ও উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না।

'দক্ষিণ রায়'— অর্থে দক্ষিণের অধিপতি বা স্বামী বা প্রভু। সাধারণ্যে বলে দক্ষিণের ঈশ্বর। গবেষকরা কেউ বলছেন বাঘের দেবতা। কেউ কৃষি দেবতা। কেউ ক্ষেত্রপাল। সাধারণ মানুষের কাছে সর্বরোগহর, সব বিপদ হর। আবার কারও কাছে তিনি একজন নামজাদা শিকারি। পরিবর্তনের ফলে বীর নায়ক থেকে আজকের

দক্ষিণ রায়। কেউ বলছেন হিন্দু ধর্মযোদ্ধা, বিধর্মীদের হাত থেকে সুন্দরবনের নিম্নবর্ণের হিন্দু-পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র এবং মুণ্ডা, ওঁরাও, রাজবংশীদের বাঁচিয়েছিলেন। মুসলমান শাসক, সুফি সাধক, পীর ও গাজীদের হাতে পড়ে যারা সেদিন ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছিলেন তাদের পথ আটকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন। আবার মনীন্দ্রনাথ জানা বলেছেন— '...প্রত্নতত্ত্ব বিদগণ বলেন মৌর্যযুগের সমসাময়িক এই দক্ষিণ রায়ের আবির্ভাব।'[১] যা হোক অনেকের মতে বাংলাদেশের দক্ষিণাংশের শাসকদের 'দক্ষিণ রায়' বলা হয়। এখানে প্রশ্ন জাগে তাহলে কি উত্তরাংশের শাসকদের 'উত্তর রায়' বলা হত। আমার মনে হয় দক্ষিণ রায় প্রতাপাদিত্যের সেনানায়ক মদন রায়েরই বংশধর। কারণ মদন রায়ই সুন্দরবনের প্রথম রাজা উপাধি পান। এই দক্ষিণ রায় সম্পর্কে আরও দুটি মত হচ্ছে— ১. তিনি প্রতাপাদিত্যের বংশধর, ২. আদিম অরণ্যবাসীর কল্পিত দেবতা।

এখন, বাংলাদেশের দক্ষিণাংশের শাসককে যদি 'দক্ষিণ রায়' বলা হয় তাহলে উত্তরের শাসককে কি 'উত্তর রায়' বলা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে ড. সুকুমার সেন বলেছেন, হ্যাঁ। তিনি দেখিয়েছেন উত্তরের শাসককে 'উত্তর রায়' বলা হয়েছে। ড. সেনের কথায় 'দক্ষিণ রায় ক্ষেত্রপাল, দক্ষিণ দিকের। উত্তর দিকের ক্ষেত্রপাল উত্তর রায় হওয়া উচিত। হয়তো ছিলও ছাতনায় যে পুরানো বাসলী মন্দিরের ইঁটে 'হামির উত্তর রায়' খোদাই আছে তা কোনও স্থানীয় রাজার নাম বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাসলীর ভৈরব, ক্ষেত্র পালের নাম হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নয়। সাধারণত উত্তর দিকের ক্ষেত্রপাল কালু রায়। ইনি দক্ষিণ রায়ের সহকারী। বাঘেও চড়েন, কুমিরেও চড়েন। কৃষ্ণরাম বলেছেন : হিজলীতে কালু রায় থানা।'[২]

দক্ষিণ রায়কে মদন রায়ের বংশধর যদি বলা হয় তাহলে একটু সময়ের গোলমাল এবং ঘটনার ওলটপালট দেখা যায়। 'গাজীর গান', 'গাজী মঙ্গল'-এ পাই পীর মোবারক গাজী— ভূস্বামী মদন রায়কে— কোনও এক নবাবের কোপ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। জমিদার মদন রায় তাঁতে খুশি হয়ে কিছু সম্পত্তি দান করেছিলেন, মসজিদ বানিয়ে দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য এই মদন রায়ের আসল নাম মদন দত্ত। তিনি রায়, রায় চৌধুরী এসব উপাধি পেয়েছিলেন। আর প্রতাপাদিত তাঁকে 'মল্ল' উপাধি দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে প্রসিত রায় চৌধুরী লেখেন—'...মদন দত্ত একবার স্বহস্তে একটা ভল্লুক বধ করে প্রতাপাদিত্যের কাছ থেকে 'মল্ল' উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি 'রায়' উপাধি নিয়ে ভূস্বামী হয়ে বসেন। পরে ঢাকার নবাব দরবার থেকে 'রায় চৌধুরী' উপাধি তাঁর বংশধরগণ লাভ করেন।'[৩]

আমরা 'রায়মঙ্গল' বা 'গাজীমঙ্গল' ও 'কালু গাজী চম্পাবতী' পুঁথি থেকে জানতে পারছি যে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড় খাঁ গাজীর যুদ্ধ এবং যুদ্ধ শেষে সখ্যার পালা, মধ্যস্থতা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ পীর। তাহলে, যে মোবারক বা বড় খাঁ গাজী—মদন রায়কে বিপদের হাত থেকে বাঁচালেন, তার প্রতিদানে মদন রায় জমি দান করলেন তাঁর বংশধর হয়ে দক্ষিণ রায় গাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন কিভাবে?

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, দক্ষিণ রায়কে একজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য বলেছেন। সুকুমার সেনের মতে— 'অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মোঙ্গল জাতির অন্যতম উপাস্য ব্যাঘ্রমানব- অপদেবতা কালক্রমে দক্ষিণ বঙ্গের জাঙ্গল-অনুপ প্রান্তে দক্ষিণ রায় ঠাকুরে পরিণত হলেন। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বড়খাঁ গাজী হলেন দক্ষিণের অধীশ্বর। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির বিরোধ মিলনের একটু ইতিহাস রয়ে গেছে দক্ষিণ রায় বড় খাঁ গাজীর গল্পের মধ্যে। হিন্দু কবির লেখা কাহিনির বিশিষ্ট নাম 'রায়মঙ্গল' মুসলমান কবির লেখা সাধারণত 'গাজী সাহেবের গান' নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দু কবির লেখায় দুটি নায়কের মধ্যে কারও মাহাত্ম্য খর্ব করা হয়নি। মুসলমান লেখক কিন্তু দক্ষিণ রায়ের হীন পরাভব দেখিয়ে তবে দু দেবতার মধ্যে দোস্তানি পাতিয়ে দেন।'[৪] আর শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন----নিম্নবঙ্গ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম পতনের পর বৌদ্ধধর্মের দেবতাগুলি অনুন্নত হিন্দুদের পূজ্য দেবতায় পরিণত হয়েছেন। দক্ষিণ রায় এভাবেই গড়ে উঠেছেন। ব্যোমকেশ মুস্তাফী একে অপৌরাণিক বনদেবতা বলেছেন— যাঁর মধ্যে দ্রাবিড়-মোঙ্গলীয় প্রভাব রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ সুধাংশু রায় তাঁর 'Retual Art of the Bratas of Bengal' গ্রন্থে বলেছেন— ভারতে মৌর্য রাজত্বের অনেক আগে বাংলাদেশে মিশরীয়দের আধিপত্য ছিল। দুজন মিশরীয় শাসক যথা উত্তর ভাগে সোনা রায় ও দক্ষিণ ভাগে দক্ষিণ রায় ক্ষমতায় ছিলেন। মিশরীয় শক্তির পতনের পর এই দুই রায় আজও বর্তমান ও পূজা পেয়ে থাকেন। এই দক্ষিণ রায়কে কেউ কেউ বাঘের দেবতা বলেছেন। ফলে তিনি মানুষ রূপে বাঘের দেবতা ছাড়াও ব্যাঘ্ররূপ বাঘের দেবতাও। কেননা প্রয়োজনে তিনি বাঘের রূপ ধারণ করতেও পারতেন। প্রমাণ হিসাবে 'বনবিবির জোহরানামা' গ্রন্থের কাহিনিতে দক্ষিণ রায় বাঘ রূপ ধর দুখেকে খেতে উদ্যত হয়েছিলেন। এখানেই জাদু বিশ্বাস কাজ করেছে। বনে-জলে-জঙ্গলে এই জাদু বিশ্বাস অরও প্রকট হয়ে দেখা দেয় বলে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে জাদু বিশ্বাসের গভীর যোগ দেখা যায়। দক্ষিণ রায়কে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রিত সংস্করণ বলেছেন কেউ কেউ। আর একজন গবেষক বলেছেন— 'দক্ষিণের কথা দক্ষিণে রায়কে বাদ

দিয়ে বলা যায় না। বলা সঙ্গত নয়। দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ রায় মানুষ, দেবতা এবং শুধু দেবতা নন, বাঘের দেবতা। বাঘের দেবতা অর্থে ব্যাঘ্ররূপী দেবতা নন। বাঘের উপর যাঁর আধিপত্য বেশি, তিনিই বাঘের দেবতা রূপে কল্পিত দক্ষিণ রায়।"[৫]

দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য সূচক কতকগুলি মঙ্গলকাব্য রচনা করা হয়েছে।...এগুলি হচ্ছে কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' রচনা কাল ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দ। হরিদেবের 'রায়মঙ্গল' রচিত হয়েছিল ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে। আর আছে রুদ্রদেবের 'রায়মঙ্গল' এটির পুঁথি খণ্ডিত। এ ছাড়া 'গাজী মঙ্গল' বা 'গাজীর গানে বনবিবির কেচ্ছা' বা 'বনবিবির জহুরনামা'তে এবং আব্দুল গফুরের 'কালুগাজী চম্পাবতী' কাব্যে দক্ষিণ রায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে।

কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণ রায়ের পরিচয় প্রকাশিত এভাবে—

"রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘ পৃষ্ঠে আরোহন এক মহাজন।।
করে ধনু পর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিলো মোরে দক্ষিণের রায়।।"

হরিদেব তাঁর 'রায়মঙ্গল' কাব্যে বলেছেন...দক্ষিণ রায় ও তাঁর ভ্রাতা কালু রায় শিবের কামজ পুত্র ভব ও শর্ব। তিনি দক্ষিণ রায়কে গণেশ বলেও উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণ রায়ের মুণ্ড প্রতীক বা বারামূর্তির বিষয় বলেছেন উহা গণেশের আদিমুণ্ড (যা শনির দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল) বিচ্ছিন্ন হয়ে দক্ষিণ অঞ্চলে পড়ে দক্ষিণ রায় দেবতায় পরিণত বা পরিগণিত হয়।

"আচম্বিতে উচাটিল গণেশের মাথা।
দক্ষিণে পড়িয়া সেই হইল দেবতা।।"[৬]

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন— চব্বিশ পরগনা ও উহার নিকটস্থ দু-এক জেলার অংশবিশেষ বহু স্থানে দক্ষিণ রায়কে গণেশের ধ্যানমন্ত্রে পূজা করা হয়। মনে হয় দক্ষিণ রায়ের প্রাধান দেখে ব্রাহ্মণরা তাঁকে স্বীকার করেন, সেই কালে তাঁরা গণেশ ও দক্ষিণ রায় আকুতি ভেদ বলে প্রচার করে আদিম যুগীয় দেবতাকে উন্নত হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মুনশী বয়নুদ্দিশ রচিত 'বনবিবির জহুরানামা' পুঁথিতে দক্ষিণ রায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—

"দণ্ড বক্ষ মুনি ছিল ভাটির প্রধান
দক্ষিণ রায় আমি তাহার সন্তান।।"

দক্ষিণ রায়ের বাবার নাম দণ্ড বক্ষ, মুনি। তাঁর মার নাম ছিল নারায়ণী।

'...মাতা ছিল তান্ত্রিক সাধিকা ও যুদ্ধ বিদ্যায় নিপুণা। মল্লযুদ্ধেও খুব পারদর্শিনী। দণ্ডবক্ষের মৃত্যুর পর দক্ষিণ রায় এই দক্ষিণ সুন্দরবনের অধীশ্বর হন। পুত্রের উপর মাতার প্রভাব খুবই প্রবল ছিল। মাতার প্রভাবে দক্ষিণ রায় তান্ত্রিক হয়ে ওঠে। দক্ষিণ রায় কর্তৃক দুঃখী রায়ের নররক্ত খাওয়ার যে কাহিনি পূর্বে জহুরানামায় আলোচিত হয়েছে সেই কাহিনি থেকে এই সত্যে উদ্ভাসিত করতে পারি যে দক্ষিণ রায় একজন তান্ত্রিক সাধক হিসাবে দুখীরামকে নিয়ে তার রক্ত পান করতে চেয়েছিলেন তা নয়। তবে তাকে তাঁর ইষ্ট দেবতার কাছে হয়তো কাপালিকের ন্যায় নরবলি দিয়ে আরও তান্ত্রিক সিদ্ধি লাভ করতে চেয়েছিল। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপাখ্যানে কাপালিক কর্তৃক নবকুমার নামক যুবাপুরুষের নরবলি দেওয়ার প্রচেষ্টার কথা এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে অর্থাৎ সুন্দরবনের দক্ষিণ অঞ্চলে যে তান্ত্রিক কাপালিকদের বিরাট আস্তানা ছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।'"

কালু রায় বা কালু পীর যুগপৎ দক্ষিণ রায় ও বড়খাঁ গাজীর বন্ধু। তিনি কুমিরের দেবতা। হিজলিতে তাঁর নিবাস। দক্ষিণ রায় বিরোধী শক্তির সঙ্গে দু-বার ভয়ানক যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিল। একবার বড়খাঁ গাজীর সঙ্গে। আর একবার বনবিবি তাঁর ভাই ও শা জঙ্গলীর সঙ্গে। উভয় ক্ষেত্রেই কালু রায়কে নিরপেক্ষ থাকতে দেখেছি। বরং বিরোধী শক্তির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের সময় বার বার তিনি উপস্থিত ছিলেন। 'রায়মঙ্গল' কাব্যে কালু রায়কে দক্ষিণ রায়ের ভাই বলা হয়েছে। কালু রায়কে নিয়ে মাহাত্ম্য কথার নাম 'কালু রায়ের গীত'। এতে বলা হয়েছে----

"দক্ষিণ রায় কালু রায় অরণ্যের সিপাই।
বাইশ কাহন বাঘে রাখে দুটি ভাই।।
বৃক্ষ রুক্ষ তলেতে বসিল দুইজন।
লইতে আপন পূজা ভাবে অনুক্ষণ।।
স্বর্গদেবে কইল পূজা মানব ভুবনে।
আমরা দেবতা বলে কেহ নাহি জানে।।
কালু বলে শুন দাদা আমার বচন।
আটেরে জিজ্ঞাসা কর পূজার বিবরণ।।"

আব্দুল গফুরের 'কালু গাজী চম্পাবতী' কাব্যে দক্ষিণ রায় ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুট রায়ের প্রধান উপদেষ্টা ও বল-ভরসা তাঁরই শক্তিতে রাজা শক্তিমান। তাঁর প্রবল শক্তির কথা ভেবে রাজকন্যা শঙ্কিত—

'...দক্ষিণা নামেতে রায় গোসাঞি পিতার
যাহার বলেতে লইল তামাম সংসার।

মনিষ্য ধরিয়া সেই আহার করয়
তাহার হস্তেতে সোপি দিবেক তোমায়।'

এই বর্ণনা থেকে জানতে পারি দক্ষিণ রায় বিশাল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি মনুষ্য খেকো বলে বর্ণিত। আর দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড়খাঁ গাজীর যুদ্ধ হয়েছিল খনিয়ার প্রান্তরে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় খনিয়া-পল্লী আজও বর্তমান। এখানে 'মুকুট রাজার দিঘি' নামে একটি দিঘি আছে। খনিয়ার উত্তরে চণ্ডীপুর গ্রামে জীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে বড়খাঁ গাজীর কবর।

দক্ষিণ রায় সম্পর্কে কাহিনি-কিম্বদন্তি কম প্রচারিত নয়। তা থেকে জন্ম সম্পর্কে তার একটি ধারণা গড়ে তোলা যায়।' কিংবদন্তি মলূক সাহিত্যে দক্ষিণ রায়ের জন্ম সম্বন্ধীয় যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তা হল, রাজা প্রভাকর শিবের বরে দক্ষিণ রায়কে পুত্ররূপে লাভ করেন।'[৮]

দক্ষিণ রায়ের যে মন্দির বর্তমানে বারুইপুরের ধপধপিতে আছে, তারই অদূরে একটি গ্রাম বাওয়ালী। এই গ্রামটিতে বাউলে বা বাওয়ালি সম্প্রদায়ের লোকজন বাস করত। যাদের কাজ ছিল বনে গিয়ে মধু, মোম ও কাঠ সংগ্রহ করা। নিকটবর্তী দক্ষিণ রায়ের মন্দিরে পূজা না দিয়ে তারা বনে যেত না। কেননা দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা তাঁকে তুষ্ট না করলে বনে গিয়ে বিপদ। বর্তমানে মানুষ তার লোভ চরিতার্থ করতে গিয়ে বন কেটে বসতি স্থাপন করেছে। জল-জঙ্গল সরতে সরতে অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছেছে। দক্ষি রায়ও পরিবর্তিত হয়েছেন। সংযোজিত হয়েছে তাঁর ধন্বন্তরি রূপ। তিনি সর্বরোগের হরণকারী। কারণ গ্রাম বাংলায় বাঘের উপদ্রব না থাকলেও রোগের উপদ্রব আছে, বিশেষত দক্ষিণ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় বাবার ধন্বন্তরী রূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে----'দক্ষিণেশ্বরকে কেউ কেউ দক্ষিণ রায় বলে, কেউ কেউ শুধু বাবা বলেই ডাকে। বাবা নাকি সাক্ষাৎ কল্পতরু। ভক্তরা বলে— বাবার কাছে যা চাইবে তাই মিলবে। আর বাবা নাকি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরিও। পৃথিবীতে হেন রোগ নেই যে বাবার দয়ায় ভালো হয় না। শিবের অসাধ্যি রোগ, ডাক্তার বদ্যিরা সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে সেই সব রুগী বাবার চন্নামেতো, তেলপড়া, জলপড়া গাছগাছালির নিংড়ানো রস খেয়ে, মালিশ করে একেবারে ভালো হয়ে গেছে।' এই পরিবর্তিত রূপ সম্পর্কে অশোক মিত্র তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' গ্রন্থে আরও বলেছেন----'ধপধপির দক্ষিণেশ্বর কিন্তু গোড়াতেই রোগ-আরামের দেবতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাঘের দেবতা। লোকে বাঘের ভয়ে তাঁর পূজা দিত।'[৯]

দক্ষিণ রায় সম্পর্কে এত পরস্পর বিরোধী মন্তব্য পর্যালোচনা শেষে একটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে তিনি যুগ যুগ ধরে বাহিত নানা সংস্কৃতির ও নানা লৌকিক দেবতার সম্মিলিত একটি রূপ। এ যেন নানা ফুলের তৈরি একটি মালার মতো। লোকায়ত এই মালার সৌন্দর্য পূর্ণরূপে দেখতে গেলে মালা রূপে তাঁকে দেখা ভালো। যেমন মালা থেকে ফুল খুলে নিলে মালার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। পৃথক পৃথক ফুলের সৌন্দর্য হয়তো পাওয়া যাবে কিন্তু তাতে মালার সৌন্দর্য পাওয়া সম্ভব হবে না। ঠিক তেমনি। যুগ যুগ ধরে নানা লোকবিশ্বাস, নানা সংস্কৃতির মিলনে গড়ে উঠেছে দক্ষিণ রায়। আর তার সাথে যুক্ত আছে নানা জাতির সম্প্রদায়ের লৌকিক উপাদান, জীবিকাগত সামাজিক প্রশ্ন ও উত্তর। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, মিশরীয় নানান ধর্ম, সংস্কৃতির সমন্বয় দক্ষিণ রায়। আর্য-অনার্য, ধর্মের মিলনে দক্ষিণ রায়। তার আসল ধর্ম লোক ধর্ম, লোকহিত তাঁর ব্রত। লোকসংস্কৃতির নানান উপাদান, নানান বৈশিষ্ট্য তাঁকে ঘিরে পাওয়া গেছে। সর্বপ্রাণবাদ, সর্বাত্মাবাদ, জাদু বিশ্বাস, সংস্কার, লোকসংস্কৃতির ঊর্ধগতি, অধোগতি, আর্যীভবন-টোটেম, ট্যাবু সব কিছুই এখানে বর্তমান।

দক্ষিণ রায়ের বিবর্তনলোক সাহিত্যের পরিমাপে ঊর্ধায়ন ছাড়া কিছু নয়। কেননা তিনি প্রথমে বৃক্ষ, পরে বাঘ থেকে শিকারি ও আরও কয়েকটি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেবতায় পরিণত হয়েছেন। পরিবর্তন এভাবে দেখানো যেতে পারে----বৃক্ষ > বাঘ > শিকারি > তান্ত্রিক > কৃষক > ভূস্বামী > ধর্মযোদ্ধা > দেবতা। এই দেবতা প্রথমে লৌকিক তারপরে উচ্চবর্ণের লোকেরা বৈদিক, কিছু গুণাবলী সংযোজিত করেছে। অধ্যাপক দুলাল চৌধুরী দক্ষিণ রায়ের বিবর্তনকে এভাবে বর্ণনা করেছেন— '...মউল্যা-মালঙ্গীর দেবতা দক্ষিণ রায়। ব্যাঘ্র-ভীতি নিরোধক দক্ষিণ রায়, দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলমহলের, বাদার ও সুন্দরবনের শস্যরক্ষক ও প্রাণত্রাতা।'[১০]

আবার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু দক্ষিণ রায়ের এই বিবর্তন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন— '...এই দেবতাটি হয়তো বার কয়েক এর রূপ পরিবর্তন করেছেন। ভক্তদের এঁর প্রতি বিশ্বাস ও ধারণার কিছু রদবদল বা মিশ্রিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত কোনও উন্নত ভাবাদর্শে। এ বিষয়ে অনুমান করা যায়, ইনি আদিতে ব্যাঘ্র তারপর ব্যাঘ্রদেবতা বিশ্বাসেই আদিতম সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তারপর ওই স্থানের আরণ্যক সমাজের ব্যক্তিরা কিছু উন্নত হলে তারা যখন শস্য উৎপাদন করতে শেখে সেই ব্যাঘ্র দেবতাই কৃষি দেবতা বা ক্ষেত্রপাল রূপে আজও বহু স্থানে পূজিত হন, বিভিন্ন রায়মঙ্গলে এই দেবতা ক্ষেত্রপাল বলেও উল্লিখিত হয়েছেন। এই

দেবতা আরও একটি রূপ ধরলেন তার কারণ বিষয় আগে বলেছি। সেটা মনুষ্য পূজার ব্যাপার, হয়তো এই সময় তাঁর দক্ষিণ রায় নামকরণ হয় ও মনুষ্য রূপ ধরেন। পরবর্তীকালে এই মনুষ্য রূপ ধরেই (সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে) সর্ব রোগের অপহর্তা হয়েছেন। বর্তমানে সেই রূপ এঁর দেখছি দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য পূজা করছি।"[১১]

দক্ষিণ রায় নামটি আধুনিক। সুতরাং মৌর্যযুগের সমসাময়িক বলে যাঁরা দাবি করেছেন তাঁদের দাবি ঠিক নয়। তিনি আদি পাঠান যুগের সর্বধর্ম সমাজরক্ষক কোনও নৃপতি হতে পারেন। দক্ষিণবঙ্গে যাঁর বসতি। তাঁর পরাক্রমে জনসাধারণ ভয়ে ও ভক্তিতে পূজা করতে শুরু করেন। সে যুগে 'দেবরাজ উপাসনা' বহুস্থানে প্রচলিত ছিল। এই পূজার জন্যই হয়তো নির্দিষ্ট রূপ দেখা দিয়েছে।

আমরা দক্ষিণ রায়ের বিবর্তনের যুক্তিগ্রাহ্য কারণ সহ স্তর বিন্যাস করতে পারি এভাবে—

১. অরণ্য দেবতা : আমরা ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাই যে একদা দক্ষিণ নিম্নবঙ্গে সমৃদ্ধশালী 'গঙ্গারিডি' রাজ্য ছিল। সমৃদ্ধ জনপদ, নগরী, দুর্গ সবকিছুই একদা বর্তমান ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে একসময় ধ্বংস হয়ে যায়। '...খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মেদনমল পরগনার শাসনভার রাজা মদন নামে একটি ভূস্বামীর ওপর অর্পিত ছিল। নবাব শায়েস্তা খাঁ তখন বঙ্গদেশ শাসন করতেন। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে এই অঞ্চল সপ্তগ্রামের অধীনে ছিল। সপ্তগ্রাম তখন ৫৩টি পরগনায় বিভক্ত ছিল। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বেশ কয়েকবার এই অঞ্চলে ঝড়, বন্যা, প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল। ফলে প্রাচীন সভ্যতার অনেক উপাদান সাগর বক্ষে বিলীন হয়ে যায়। বহু জনপদ নিমজ্জিত হয়, অনেক মানুষ প্রাণ হারায়। সভ্যতার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই গড়ে ওঠে 'সুন্দরী'-বনভূমি। আর বিলুপ্ত হয় গরাণ-হেতালের বনাঞ্চল। নদী-নালা বেষ্টিত বনভূমি অবাধে বাঘ, হরিণ, সাপ এবং নদীতে কুমিরের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়।"[১১]

আমরা দেখতে পাই যে, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরবন রায়তী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। তখন এখানে দেড় লাখেরও বেশি রায়ত, ত্রিশ হাজারেরও বেশি অধস্তন রায়ত এবং আট হাজারেরও ওপর চকদার। সুন্দরবনের জমির মালিকানা কৃষকদের ছিল না, প্রকৃত মালিক ছিল লাটদার-চকদার, জমিদারেরা। আর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর বাংলার নতুন নবাব মীরজাফর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে ২৪টি

জংলীমহল বা পরগনার জমিদারি স্বত্বাধিকার দিয়েছিলেন তার অন্যতম ছিল মেদন্মল বা মদনমল পরগনা। একদা যার অধিপতি ছিল মদন রায়। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে রায়তী ব্যবস্থা চালু হলেও সুন্দরবনের জঙ্গল আবাদ করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। আর একাজে বহিরাগত মুণ্ডা, সাঁওতাল, ভূমিজ ওঁরাও ও স্থানীয় পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, বাগদি-নমঃশূদ্ররাও যোগ দিয়েছিল। এরা সবাই নিচুতলার মানুষ। জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে তাদের এরকম খালি হাতে লড়তে হয়েছে বাঘ, সাপ, কুমির, বন্য শুয়োর এবং নানারকম অলৌকিক শক্তি যথা----ভূত, প্রেত, দত্যি-দানোর বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সর্বাত্মাবাদ ও সর্বপ্রাণবাদের ধারণা গড়ে উঠেছিল অবশ্যম্ভাবী রূপে। ফলে নানা লোকবিশ্বাস, সংস্কার গড়ে উঠেছিল। এ ছাড়া যারা জঙ্গলে মোম, মধু, কাঠ ও মাছের খোঁজে যেত, সেই বাউলে-মউলেদের মনেও জল-জঙ্গলের রহস্যময়তা নানা প্রশ্ন তুলেছিল। তাছাড়া সমুদ্র উপকূলে মিলত নুন। ফলে এসব তাদের মনে ভীতির জন্ম দিয়েছিল। সেই ভয় থেকেই জন্ম নিয়েছিল অরণ্য দেবতার। তার নাম ছিল নাম, না ছিল মূর্তি, অরণ্য পূজার মাধ্যমেই তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন ও তুষ্টিকরণ। অবয়বহীন বৃক্ষরূপী অরণ্য দেবতাই সেদিন সুন্দরবনের বনজীবী মানুষের একমাত্র অবলম্বন ছিল।

২. বাঘ : এরপর মানুষের দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গল করার অভিজ্ঞতা থেকে তাদের মনে জেগে ওঠা নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে লাগল। প্রথমে যা তাদের কাছে রহস্যময় ও লৌকিক মনে হয়েছিল তার অনেকটাই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলো নিজের মতো করে। অশরীরী শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করতে তুক্‌তাক্‌, মন্ত্রতন্ত্র নিজেরাই গড়ে তুলল, সংগ্রহ করল দলের অভিজ্ঞ বাউলে, মউলের কাছ থেকে। ছোটোখাটো বা কম শক্তির বন্য জন্তুকে প্রতিহত করার মতো অস্ত্র নিজেরাই গড়ে নিল, কিন্তু প্রবল শক্তিধর বাঘকে বশে আনতে পারল না। তার হিংস্রতার কাছে, শক্তির কাছে মানুষ হার মানল। আর কিছু কিছু মানুষের টোটেম বা কুল প্রতীক হল অমিত শক্তিধর বাঘ। ফলে তাকে তুষ্ট করতে ব্যাঘ্র পূজার শুরু হল।

৩. শিকারি : বাউলে-মউলে-মালঙ্গী যারা বনজীবী। তাদের মধ্যে কেউ পাকা শিকারি হয়ে উঠল। তুকতাক-মন্ত্রতন্ত্রও তার করায়ত্ত হল। বনে-বাদায় কোথায় তার আস্তানা, কোন স্থানে গেলে বেশি মধু পাওয়া যাবে, কিভাবে বাঘের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে----কিভাবে তাকে প্রতিহত করা যাবে এসব তার নখদর্পণে চলে এল। সে হল দল নেতা। তার সঙ্গী হল তীর, ধনুক, বর্শা। বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ের অনেকগুলি অস্ত্র। সাধারণ মানুষ বাঘের সঙ্গে সঙ্গে সেই শিকারি মানুষটিকে গুরুত্ব

দিতে লাগল। তার কথামতো কাজ করতে শুরু করল। কথা না শুনলে দলনেতা শাস্তির ব্যবস্থা করলো। ফলে ভয়ে হোক আর বীরত্বে হোক শিকারি বন্দনা শুরু হল।

৪. তান্ত্রিক : শিকারি পুরুষটি আরও অলৌকিক ক্ষমতার লোভে নানাপ্রকার সাধনা শুরু করে দিল। তন্ত্র সাধনা শুরু করল। প্রয়োজনে পশু, মানুষ বলি দিয়ে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাকে আরও বাড়াতে চাইল। অদৃশ্য, অলৌকিক শক্তিকে বশীভূত করে নিজের একাধিপত্য জারি করতে গিয়ে সে সাজল তান্ত্রিক। তন্ত্রবিদ্যা চর্চা শুরু করে দিল। জঙ্গলবাসী, বাঘের মুখ বন্দীর খিলান মন্ত্র ছাড়াও ভূত-প্রেত-পিশাচকে বশীভূত করে আরও বেশি ক্ষমতার জন্য নানান লৌকিক বা লোকায়ত আচার শুরু করল। সাধারণ মানুষ— তার অলৌকিক ক্ষমতার মোহে বা বিস্ময়ে তার পদানত হল, ভক্তি করতে শুরু করলো।

৫. কৃষক : একদিকে জঙ্গলের সমৃদ্ধ মোম, মধু, কাঠ, মাছ সংগ্রহের সাথে সমুদ্র উপকূলে লবণ পাওয়া গেল। মানুষ কাঠের জন্য জঙ্গল হাসিল করল। সেই জঙ্গলে গড়ে উঠল জমি। আর তান্ত্রিক ও গুণিন মানুষটি জমির দিকে হাত বাড়াল। সে জমি অধিগ্রহণ করে তার মালিক হল। সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কৃষিকাজ শুরু করলো।

৬. ভূস্বামী : মানুষের প্রয়োজনে জঙ্গল ক্রমশ কমলে লাগল, বাড়তে লাগল ভূমি। এ জমির দখল নিল কৃষক। সে হল সমগ্র জমির মালিক। ফলে সে আর কৃষক রইল না, জমিদার ভূস্বামীতে পরিণত হল। তার অধীনে রইল বহু চাষি। ভূস্বামীর কথায় তারা ওঠবোস করতে লাগল। কেননা জমিদারের লেঠেল আর গুণ্ডা বাহিনী তৈরি হল। নায়েব, পেয়াদা, গোমস্তা দেখভালের জন্য আরও নানান কর্মচারী। জমিদারের কথা না মানলে জমি হারানোর ভয়। জমিদার নিত্যনতুন করের বোঝা চাপান, দাদনের ফাঁদে বন্দী হল চাষি। ভয়ে পড়ে ভক্তি জন্মাল। জমিদার প্রজা হিতার্থে নানারকম মঙ্গলজনক, উন্নয়নমূলক কাজ করলেন। হলেন ক্ষেত্রপাল।

৭. ধর্মযোদ্ধা : দীর্ঘদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণাংশ এবং নিম্নবঙ্গ মুসলিম অধিকারে ছিল। ফলে ইসলামি সংস্কৃতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। পীর ফকিরের হাতে পড়ে সেদিন নিম্নবর্গের শ্রেণীর হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এ ছাড়া তাদের উপায়ও ছিল না। রক্ষণশীল উচ্চ শ্রেণির বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা নিষ্পেষিত, অত্যাচারিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা সুফি ধর্মের উদারতা ও পীর ফকিরদের অলৌকিক ক্ষমতার দর্শনে অন্য ধর্মে বাধ্য হয় নাম লেখাচ্ছিল। তবে সবাই যে কাজে সম্মত ছিল তা নয়। নিম্ন শ্রেণির অনেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইল। কিন্তু

যোগ্য নেতা কোথায়? ভূস্বামী হলেন ধর্মযোদ্ধা। তিনি স্ব-ধর্ম ও সমাজকে অন্য ধর্মের হাত থেকে রক্ষা করতে হাতে তুলে নিলেন অস্ত্র। বাহন হল অশ্ব, বাঘ ইত্যাদি। সাধারণ লৌকিক সমাজের মানুষজন তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হল। তাঁকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে লাগল। দক্ষিণবঙ্গের সম্রাট রূপে তাঁর মাহাত্ম্য কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

৮. রাজা দক্ষিণ রায় : ধর্মযোদ্ধা কালক্রমে রাজা হলেন। ভাটি অঞ্চল হল তাঁর রাজ্য। তাঁর মিত্র হলেন, ভাই হলেন----কালু রায়। বিরোধী পক্ষ গাজীপীর, বনবিবির সঙ্গে সখ্যতা হল। যুগের প্রয়োজনে রাজার হাত উঠে এল বন্দুক। তিনি হলেন মানুষ ও বাঘের অধিপতি।

৯. ধন্বন্তরি : এক সময় বাঘের ভয় কমে গেল। বিধর্মীদের আক্রমণও রইল না। জঙ্গল কমল, মানুষ নির্ভরশীল হল কৃষির উপর। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, সংসারী মানুষের কত না জ্বালা, নিত্যনতুন অসুখ-বিসুখে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। ফলে রোগ-শোকের হাত থেকে বাঁচতে আবার ছুটল রাজার কাছে। রাজা অভয় দিলেন। সাধারণের কাছে হলেন সর্ব বিপদতারণ, সর্ব রোগহর ধন্বন্তরি।

গ্রন্থপঞ্জী:—

১. চব্বিশ পরগনা : উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন — কমল চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২. চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী ও পালাগান— দেবব্রত নস্কর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩. পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ মেলা— অশোক মিত্র

৪. পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী ও লৌকিক বিধান— বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫. লৌকিক সমাজ ও সংস্কৃতি দর্পণে পীর-গাজি-বিবি— তুহিনময় ছাঁটুই, সোনারপুর।

৬. সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি—নির্মলেন্দু দাস, কলকাতা